দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়তের উৎস

ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধি-বিধানের সমষ্টি। বিশ্বাসগত বিষয়গুলোর পাশাপাশি মানবজীবনের আচরণগত সমস্ত দিকও ইসলামে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য নানা বিধি-বিধান ও আচার-আচরণগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এসব বিধি-বিধানকেই শরিয়ত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করা, শরিয়তের অন্যতম দাবি। এগুলোর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা লাভ করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামি শরিয়তের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি শরিয়তের উৎসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- শরিয়ত ও শরিয়তের উৎসের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন ও হাদিসের সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব;
- মক্কি ও মাদানি সূরার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলো শুদ্ধভাবে মুখস্থ বলতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলোর অর্থ ও পটভূমিসহ (শানে নুযুল) শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআনের নির্বাচিত সূরাগুলোর শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হব;
- নির্বাচিত দশটি হাদিসের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অর্জনের ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্বাচিত হাদিসসমূহের শিক্ষার আলোকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব;
- ইজমা এর পরিচয় ও উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কিয়াস এর ধরন বর্ণনা করতে পারব;
- শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব।

পাঠ ১

শরিয়ত (شَرِيْعَةٌ)

পরিচয়

শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

ইসলামি পরিভাষায় ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়। অন্যকথায়, ইসলামি আইন-কানুন বা বিধি-বিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে।

শরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : "অতঃপর আমি আপনাকে শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন। আর আপনি অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত ১৮)

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হলো মানবজাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল বিষয়ের বিধি-বিধান ও নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

সুতরাং বোঝা গেল যে, ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধি-বিধান।

খ. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতি-নীতি।

গ. বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন।

বস্তুত মানুষের সবধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের আওতাভুক্ত। ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল কাজই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজই নেই।

শরিয়তের গুরুত্ব

মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়ত হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান। সুতরাং শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল খুশি হন। অন্যদিকে, শরিয়ত অস্বীকার করা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার নামান্তর। কোনো মুসলমান এরূপ কাজ করতে পারে না। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অস্বীকার করাও মারাত্মক পাপ (কুফর)। যে ব্যক্তি এরূপ করে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮৫)

শরিয়ত হলো জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা। এর দ্বারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ জানা যায়।

কোনটি হালাল, কোনটি হারাম ইত্যাদি জানা যায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানও শরিয়তের শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার নানা শিক্ষাও শরিয়তে বিবৃত রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য শরিয়ত অপরিহার্য।

তাছাড়া শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময়ে আদায় করতে হয় তাও শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত। অতএব, মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরিয়তের উৎসসমূহ

শরিয়ত হলো ইসলামি জীবনপদ্ধতি। এটি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। অতএব, শরিয়ত এর প্রধান উৎস দুটি। যথা- আল-কুরআন ও আল-হাদিস বা সুন্নাহ।

পরবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহ এর স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরও দুটি উৎস নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হলো ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং আমরা বলতে পারি- শরিয়ত এর উৎস চারটি। যথা-

১. আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ)

২. সুন্নাহ (اَلسُّنَّةُ)

৩. ইজমা (اَلْاِجْمَاعُ)

৪. কিয়াস (اَلْقِيَاسُ)

আমরা পর্যায়ক্রমে শরিয়তের এ চারটি উৎস সম্পর্কে জানব।

কাজ : শিক্ষার্থী ইসলামি শরিয়তের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন

শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎসই আল-কুরআন। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল-কুরআন শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইঙ্গিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯)

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز

অর্থ : "আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৯)

কুরআন মজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত। এতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা, কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

অর্থ : "আমি তো কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৫৮)

অবতরণ

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। এটি 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ○ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ○

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ২১-২২)

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে 'বায়তুল ইযযাহ' নামক স্থানে নাজিল করেন। বায়তুল ইযযাহ হলো প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান।

মহানবি (স.) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবি (স.)-এর নিকট অবতরণ করেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে আল-কুরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স.)-এর প্রতি কুরআন নাজিল হয়।

এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাজিল হতো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ○

অর্থ : "আর আমি খণ্ড-খণ্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১০৬)

অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একসাথে নাজিল করা হয়নি। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি একসাথে পূর্ণাঙ্গ আকারে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু আল-কুরআন এর ব্যতিক্রম। এটি আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে রাসুল (স.)-কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবার অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৩২)

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অল্প অল্প করে মহানবি (স.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতি জীবনে পূর্ণরূপে নাজিল করেন।

পাঠ ৩

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন আরব দেশে মহানবি (স.)-এর উপর নাজিল হয়। এ সময় মহানবি (স.) সাথে সাথে নাজিলকৃত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন। এরপর বারবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। আল-কুরআন মুখস্থকরণে রাসুল (স.)-এর দ্রুতপাঠ ও ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۞

অর্থ : "তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্ত করার জন্য আপনি দ্রুত আপনার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৬-১৭)

এরপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ব্যাকুলতা দূরীভূত হয় এবং তিনি সহজেই কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করে সংরক্ষণ করতে লাগলেন।

আল-কুরআন নাজিল হলে রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকেও তা মুখস্থ করতে বলতেন। সাহাবিগণ তা মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, নামাযে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদেরও মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত। অনেক সময় রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং তাঁদের গৃহপার্শ্বে গিয়ে তিলাওয়াত শুনতেন।

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবি করিম (স.) সাহাবিগণকে নানা স্থানে প্রেরণ করতেন। যেমন হিজরতের পূর্বে তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা.) ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেন।

এভাবে মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তারা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনো ভুলত না। ফলে এ অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে পবিত্র কুরআন সহজেই তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

এছাড়া সেসময় লিখিতভাবেও আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আরবদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছিল শিক্ষিত। তা ছাড়া সেসময় লেখার উপকরণও ছিল দুষ্প্রাপ্য। এজন্য সেসময় আল-কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। তবে আল-কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথেই লিখে রাখা হতো। খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদি ছিল তখনকার লেখনীর উপকরণ। সাহাবিগণ এগুলোতেই আল-কুরআনের আয়াত লিখে তা সংরক্ষণ করতেন।

যেসব সাহাবি লেখাপড়া জানতেন তাঁরা প্রায় সকলেই কুরআন লিখার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আল-কুরআন লিপিবদ্ধকারী সাহাবিগণকে বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় মোট ৪২ জন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)। এছাড়াও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত মুআবিয়া (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.), হযরত আমর ইবনে আস (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আরকাম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ না কেউ সদা সর্বদা রাসুলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে থাকতেন এবং কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথে তা লিখে নিতেন। এভাবে লেখনীর মাধ্যমেও আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি (স.)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর সময়ে নবুয়তের কতিপয় মিথ্যা দাবিদার বা ভণ্ড নবি ও যাকাত অস্বীকারকারীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এরূপই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এটি মুসায়লিমা কাযযাব নামক ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিয সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন। এতে হযরত উমর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন যে, এভাবে হাফিয সাহাবিগণ শাহাদাত বরণ করতে থাকলে একসময় কুরআন মুখস্থকারী লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেবে। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দান করেন। পরামর্শ শ্রবণে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে উমর! রাসুলুল্লাহ্ (স.) যে কাজ করে যাননি তা আপনি কীভাবে করতে চাচ্ছেন? হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! এতে কল্যাণ রয়েছে। এভাবে হযরত উমর (রা.)-এর বারবার অনুরোধ করায় হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত যায়দ (রা.) কুরআন সংকলনের

ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত চারটি পন্থা অবলম্বন করেন :

ক. হাফিয সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাইকরণ।

খ. হযরত উমর (রা.)-এর হিফজের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ।

গ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ।

গ. চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাইকরণ।

এভাবে চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আল-কুরআন। কুরআনের এ কপিটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর পবিত্র কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কন্যা, উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্য দেখা দেয়। এর মূল কারণ ছিল বিভিন্ন গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পাঠ। মহানবি (স.) সহজ করণার্থে আরবদের ৭টি রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরবগণ এ ৭টি রীতিতে পাঠের বিষয়টি জানতেন বলে প্রথমদিকে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ইসলামি খেলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে অনারবগণ মুসলমান হতে লাগল। তারা আরবি ভাষার এসব আঞ্চলিক রীতিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান অঞ্চলে জিহাদের সময়। এ সময় ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ঘটনাটি খলিফা হযরত উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন।

এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য চারজন সাহাবির একটি বোর্ড গঠন করেন। এঁরা ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে আস এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (রা.)। এ বোর্ডের নেতৃত্ব হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) সর্বপ্রথম হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসেন এবং এ থেকে আরও সাতটি কপি তৈরি করেন। অনুলিপি তৈরিতে সাহাবিগণ হাফিযগণের কেরাতের সাথে মিলিয়ে পুনরায় এর নির্ভুলতা যাচাই করতেন। অতঃপর মূল কপিটি হযরত হাফসার (রা.) নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তৈরি অনুলিপিগুলোর একটি খলিফার নিকট কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয় আর বাকিগুলো বিভিন্ন শাসনকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আল-কুরআন বিকৃতি ও গরমিলের হাত থেকে রক্ষা পায়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত কপিগুলো একত্র করে তা পুড়িয়ে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আল-কুরআন সংকলিত হয়। এ মহান কাজের জন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী (সংকলক) বলা হয়।

কুরআনের এ সংকলনসমূহে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশনার কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) যেভাবে কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে বলে গেছেন সেভাবেই সংকলন করা হয়। এভাবে সূরাসমূহেও রাসুলুল্লাহ (স.) বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো হয়। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই রাসুলুল্লাহ (স.)-কে এরূপ ধারাবাহিকতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। জিবরাইল (আ.) যখনই কোনো আয়াত নিয়ে আসতেন তখনই ঐ আয়াত কোন সূরার কোথায় স্থাপন করতে হবে তা বলে দিতেন। সে অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবিগণের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। ফলে লাওহে মাহফুজে যেভাবে

কুরআন বিন্যস্ত রয়েছে বর্তমান কুরআন মজিদও ঠিক সে বিন্যাসেই বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে হরকত বা স্বরচিহ্ন ছিল না। ফলে অনারব মুসলমানগণ কুরআন তিলাওয়াতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করে এ অসুবিধা দূর করেন। বস্তুত এটা কুরআনে কোনো নতুন সংযোজন নয়। বরং আগে হরকতসহ পড়া হলেও তা লিখা হতো না। কেননা আরবগণ এমনিই তা বুঝতে পারতেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উচ্চারিত এসব হরকতসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন মাত্র। ফলে অনারবগণের জন্যও কুরআন তিলাওয়াতের বাধা অপসারিত হয়।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআন আরও নবতর ও সহজ উপায়ে সংকলন করা হয়। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হাতের লিখার মাধ্যমেই আল-কুরআন সংকলন করা হতো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরবর্তীতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রণ করা হতে থাকে। এমনকি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থী আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৪

মক্কি ও মাদানি সূরা

আল-কুরআন সর্বমোট ৩০টি অংশে বিভক্ত। এ অংশগুলোকে পারা বলা হয়। কুরআন মজিদে রয়েছে ১১৪টি সূরা এবং ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি আয়াত। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা- মক্কি ও মাদানি। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

মক্কি সূরা

সাধারণভাবে বলা যায়, পবিত্র মক্কা নগরীতে আল-কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলো মক্কি সূরা। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মক্কি সূরা বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, "মহানবি (স.)-এর হিজরত কালে মদিনায় গমনের পথে মদিনায় পৌছার পূর্বপর্যন্ত যা নাজিল হয় তাও মক্কি সূরা।"

আল-কুরআনে মক্কি সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি।

মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।
২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা এসব সূরায় প্রাধান্য লাভ করেছে।
৩. শিরক-কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।
৪. মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫. এতে পূর্ববর্তী মুশরিক ও কাফিরদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী, ইয়াতীমদের সম্পদ হরণ করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথা ও কু-আচরণের বিবরণ রয়েছে।
৬. পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের সফলতা ও তাঁদের অবাধ্যদের শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।
৭. এ সূরাগুলোতে শরিয়তের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে।
৮. এতে উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে।
৯. এ সূরাসমূহ সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট।
১০. এর শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।
১১. এতে প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহ শপথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাদানি সূরা

সাধারণ ভাষায় বলা যায়, মদিনাতে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাকে মাদানি সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, "মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর মদিনার বাইরে সফরে থাকাবস্থায় নাজিল হওয়া সূরাসমূহও মাদানি সূরা।" অর্থাৎ হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাই মাদানি সূরা। মাদানি সূরা মোট ২৮টি।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাদানি সূরাসমূহে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে।
২. এতে আহলে কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. এ সূরাসমূহে নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।
৫. পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে।
৬. বিচার ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
৭. ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে।
৮. শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।
৯. এ সূরাগুলো ও এর আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।

কাজঃ শিক্ষার্থী মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে একটি বড় পোস্টার বাড়িতে তৈরি করে এনে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৫

তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ মুখস্থ পড়া যায়, আবার দেখেও তিলাওয়াত করা যায়। আল-কুরআনকে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে তা পাঠ করতে হয়। অতঃপর হরকত, হরফ ইত্যাদি চিনে তাজবিদ সহকারে পাঠ করতে হয়। আমরা অনেকেই পুরো কুরআন মজিদ মুখস্থ করতে পারিনি। সুতরাং আমরা নিয়মিত দেখে দেখে তাজবিদসহ আল-কুরআন তিলাওয়াত করব। এভাবে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম কাজ। এতে অনেক নেকি বা সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-ভাণ্ডার। এতে যেমন তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, তেমনি পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য একজন ফরাসি পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, "কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

সুতরাং হালকাভাবে আল-কুরআন পাঠ করলেই চলবে না। বরং একে খুবই গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এতে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আমরা আল-কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারব। আল্লাহ তায়ালাও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "এটি কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সা'দ, আয়াত ২৯)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (সূরা আল-কামার, আয়াত ২২)

অতএব, বুঝেশুনে ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন পড়া উচিত। এভাবে তিলাওয়াত করলে আল-কুরআনের শিক্ষা ও উপদেশ অনুধাবন করা যায়।

চিন্তা-গবেষণার পাশাপাশি আল-কুরআন সহিহ-শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করাও অত্যাবশ্যক। কুরআন মজিদ ভুল ও অসুন্দর সুরে তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। অশুদ্ধ ও অসুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে নামায শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়মকে তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা তাজবিদের নানা

নিয়মকানুন জেনে এসেছি। তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

অর্থ : "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ -

অর্থ : "যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।" (বুখারি)

বস্তুত রাসুলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরাও শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এর প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতেই নেকি পাওয়া যায়। নবি করিম (স.) বলেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا -

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশ গুণ।" (তিরমিযি)

বস্তুত, কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِيْ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ -

অর্থ : "আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত।" (বায়হাকি)

কুরআন হলো নুর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "এই অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসুল (স.), এর পরিশোধক কী? তিনি বললেন, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।" (বায়হাকি)

প্রকৃতপক্ষে, যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করলে মানুষ প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)। অতএব, আমরা কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হব।

শানে নুযুল

'শান' শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। অতএব, শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি পরিভাষায়, আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়। একে 'সববে নুযুল'ও বলা হয়।

আল-কুরআন মহানবি (স.)-এর প্রতি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং নানা প্রয়োজন উপলক্ষে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোনো সমস্যার সমাধানে কুরআনের অংশবিশেষ নাজিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুযুল বলা হয়। যেমন : রাসুলুল্লাহ (স.)-এর শিশুপুত্র ইন্তিকাল করলে কাফিররা তাঁকে আবতার বা নির্বংশ বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা আল-কাওসার নাজিল করেন। অতএব, মহানবি (স.)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাস করার ঘটনাটি সূরা আল-কাওসারের শানে নুযুল হিসেবে পরিচিত।

শানে নুযুল জানার উপকারিতা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।

খ. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থী কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৬

সূরা আশ-শামস (سُوْرَةُ الشَّمْسِ)

পরিচয়

সূরা আশ-শামস মক্কি সূরার অন্তর্গত। এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি। এ সূরার প্রথম শব্দ শামস থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আশ-শামস। এটি আল-কুরআনের ৯১তম সূরা।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ
وَ	শপথ, কসম
اَلشَّمْسِ	সূর্য
ضُحٰهَا	তার কিরণ
اَلْقَمَرِ	চন্দ্র
تَلٰهَا	তার পশ্চাতে আসে
اَلنَّهَارِ	দিন, দিবস
جَلّٰهَا	তাকে প্রকাশ করে
اَلَّيْلِ	রাত, রাত্রি
يَغْشٰهَا	তাকে আচ্ছাদিত করে, ঢেকে ফেলে
اَلسَّمَاءِ	আকাশ, আসমান
مَا	যিনি, যা
زَكّٰهَا	নিজেকে পবিত্র করবে
خَابَ	ব্যর্থ হবে
دَسّٰهَا	নিজেকে কলুষিত করবে
كَذَّبَتْ	মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, অস্বীকার করেছিল
ثَمُوْدُ	ছামুদ জাতি
بِطَغْوٰهَآ	তাদের অবাধ্যতা দ্বারা
اِذِ	যখন
اِنْبَعَثَ	তৎপর হয়ে উঠল
اَشْقٰهَا	তাদের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি
فَقَالَ	অতঃপর বললেন
رَسُوْلُ اللهِ	আল্লাহর রাসুল

بَنٰهَا	- তৈরি করেছেন, নির্মাণ করেছেন
اَلْاَرْضِ	- জমিন, পৃথিবী
طَحٰهَا	- তা বিস্তৃত করেছেন
نَفْسٌ	- প্রাণ, আত্মা, মানুষ
سَوّٰهَا	- তাকে সুঠাম করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন
فُجُوْرَهَا	- তার পাপকর্ম, অসৎকর্ম
تَقْوٰهَا	- তার সৎকর্ম
اَفْلَحَ	- সফলকাম হবে, সফলতা লাভ করবে।
نَاقَةَ	- উষ্ট্রী
سُقْيٰهَا	- তাকে পানি পান করানো
فَعَقَرُوْهَا	- অতঃপর তারা তাকে কেটে ফেলল
فَدَمْدَمَ	- অতঃপর ধ্বংস করে দিলেন
بِذَنْۢبِهِمْ	- তাদের পাপের কারণে
لَا يَخَافُ	- তিনি ভয় করেন না
عُقْبٰهَا	- তার পরিণাম

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ○	১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের।
وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ○	২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ○	৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে।
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ○	৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে।
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ○	৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।
وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ○	৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।
وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ○	৭. শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, তাঁর।
فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ○	৮. অতঃপর তিনি তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○	৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○	১০. আর সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ○	১১. ছামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল।
اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ○	১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۟

১৩. তখন আল্লাহর রাসুল তাদের বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে তোমরা সাবধান হও।

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۠ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۟

১৪. কিন্তু তারা তাঁকে (রাসুলকে) অস্বীকার করল ও তাকে (উষ্ট্রীকে) কেটে ফেলল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۟

১৫. আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) এর পরিণাম সম্পর্কে ভয় করেন না।

ব্যখ্যা

সূরা আশ-শামস-এ বর্ণিত আয়াতসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো সূরার প্রথম সাত আয়াত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কতিপয় সৃষ্টবস্তু, এদের অবস্থা ও এদের স্রষ্টা সম্পর্কে শপথ করেছেন। মানুষের শপথ করেছেন। এসব জিনিসের শপথ করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়ের তাগিদ করেছেন। সূরার দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে পাপের দ্বারা কলুষিত করে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সৎকর্ম করে তার জন্য রয়েছে সফলতা।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তায়ালা ছামুদ সম্প্রদায়ের উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যর্থতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। ছামুদ সম্প্রদায় ছিল খুবই উন্নত-সমৃদ্ধ একটি জাতি। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রেরিত রাসুলকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। তাদের এ অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের ধ্বংস করে দেন।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালাই আসমান, জমিন ও মানুষের স্রষ্টা।

২. তিনিই সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিনের আবর্তন ঘটান।

৩. তিনিই মানুষের ভালো-মন্দ, সৎকর্ম-অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেন।

৪. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে সে সার্বিক সফলতা লাভ করবে।

৫. আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ পংকিলতায় জড়িয়ে ফেলবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হবে।

৬. আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা অবাধ্য ছিল আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে সচেতন থাকব। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। সৎ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেদের পূত-পবিত্র রাখব। তাহলেই আমরা ইহ-পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আশ-শামস-এর শিক্ষা লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৭
সূরা আদ-দুহা (سُوْرَةُ الضُّحٰى)

পরিচয়

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম শব্দ দুহা থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আদ-দুহা।

শানে নুযুল

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (স.) অসুস্থ থাকার কারণে দুই-তিন রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। এ সময় জিবরাইল (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আগমন করেননি। এতে মক্কার কাফির-মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে।

অন্যদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলতে লাগল, "হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার নিকট যে শয়তান আসত সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুই-তিন রাত যাবৎ আমি তাকে তোমার নিকট আসতে দেখছি না।" কাফিরদের এসব কথায় ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মহানবি (স.) মর্মাহত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করে এ সূরা নাজিল করেন। এ সূরার মাধ্যমে কাফিরদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদও জানানো হয়।

শব্দার্থ

শব্দ		অর্থ
وَ	-	শপথ
اَلضُّحٰى	-	পূর্বাহ্ন, দিনের প্রথম ভাগ
اَلَّيْلِ	-	রাত
اِذَا	-	যখন
سَجٰى	-	অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, নিঝুম হয়
مَا وَدَّعَكَ	-	তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি; ছেড়ে যাননি
مَا قَلٰى	-	তিনি অসন্তুষ্ট হননি, বিরূপ হননি
اَلْاٰخِرَةُ	-	পরকাল, আখিরাত, পরবর্তী সময়, পরজীবন
خَيْرٌ	-	উত্তম, ভালো
لَّكَ	-	আপনার জন্য, তোমার জন্য
اَلْاُوْلٰى	-	প্রথম, ইহকাল, দুনিয়ার জীবন, পূর্ববর্তী সময়
سَوْفَ	-	অতি শীঘ্র, অচিরেই
يُعْطِيْكَ	-	তিনি আপনাকে দান করবেন
تَرْضٰى	-	আপনি সন্তুষ্ট হবেন
اَلَمْ يَجِدْكَ	-	তিনি কি আপনাকে পাননি?
يَتِيْمًا	-	ইয়াতীম, অনাথ, আশ্রয়হীন
فَاٰوٰى	-	অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন
وَجَدَ	-	তিনি পেয়েছেন
ضَآلًّا	-	পথ সম্পর্কে অনবহিত
فَهَدٰى	-	অতঃপর তিনি পথ প্রদর্শন করলেন
عَآئِلًا	-	অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব
فَاَغْنٰى	-	অতঃপর ধনী বানালেন, অতঃপর তিনি অভাব দূর করলেন
فَلَا تَقْهَرْ	-	অতএব আপনি কঠোর হবেন না
اَلسَّآئِلَ	-	প্রার্থী, ভিক্ষুক, অভাবী
لَا تَنْهَرْ	-	আপনি ধমক দেবেন না
نِعْمَةِ	-	নিয়ামত, অবদান, ধনদৌলত, অনুগ্রহ
حَدِّثْ	-	আপনি বর্ণনা করুন, প্রচার করুন, প্রকাশ করুন, জানিয়ে দিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالضُّحٰى ۙ	১. শপথ পূর্বাহ্ণের।
وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ	২. শপথ রাতের, যখন তা নিঝুম হয়।
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ	৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۙ	৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۙ	৫. অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۠	৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন।
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۠	৭. তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۙ	৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি অভাবমুক্ত করেছেন।
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ	৯. সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ	১০. এবং প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۧ	১১. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ব্যক্তি। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। মহান আল্লাহ তাঁদের অজস্র নিয়ামত দান করেন। তাঁদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালার হাবিব অর্থাৎ প্রিয়তম বা বন্ধু। আল্লাহ তাঁকে সর্বাবস্থায় সাহায্য ও নিয়ামত দান করেন।

আমরা জানি, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম রহমতে তাঁকে সুন্দরভাবে লালনপালন করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মানবজাতির দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য ও পরকালীন মুক্তির জন্য চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিদায়াত দান করেন, সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। মহানবি (স.) দরিদ্র ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে অভাবমুক্ত করেন। সচ্ছলতা দান করেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.)-কে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালা বহু নিয়ামত দান করেন।

পাশাপাশি পরকালেও আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে নানা নিয়ামত দান করার সুসংবাদ দান করেছেন এ সূরায়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, মহানবি (স.)-এর আখিরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। সেখানে তিনি উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

এ সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেন। রাসুল (স.)-কে ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করার আদেশ দেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন :

১. আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না।

২. তিনিই তাঁদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

৩. পরকালে তিনি তাঁদের কল্যাণময় জীবন দান করবেন।

৪. ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা।

৫. অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাঁদের ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

৬. দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালার দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইমান, কুরআন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এসবের জন্য আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এসব নিয়ামতের কথা মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আদ-দুহা -এর শানে নুযুল নিজ খাতায় মুখস্থ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

সূরা আল-ইনশিরাহ (سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ)

পরিচয়

সূরা আল-ইনশিরাহ মক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা মোট ৮। এটি আল-কুরআনের ৯৪তম সূরা। সূরার প্রথম আয়াতে নাশরাহ (نَشْرَحْ) শব্দের ক্রিয়ামূল বিবেচনায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-ইনশিরাহ।

শানে নুযুল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত লাভের পূর্বেও মক্কা নগরীর অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত। তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত। নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট মূল্যবান ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখত। সর্বোপরি মহানবি (স.) ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (স.)

ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসীরা তার বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকে। তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে। মহানবি (স.) ও নওমুসলিম সাহাবিগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এমনকি নামাযরত অবস্থায় মহানবি (স.)-এর উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিত, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, তাঁর কথা না শোনার জন্য কানে আঙ্গুল দিত। এরকম নানাভাবে কাফিররা মহানবি (স.)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। কাফিরদের এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যায় অত্যাচারে রাসুলুল্লাহ (স.) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

শব্দার্থ

শব্দ		অর্থ
اَ	-	কি?
لَمْ نَشْرَحْ	-	আমি প্রশস্ত করিনি বা উন্মুক্ত করিনি?
صَدْرَكَ	-	আপনার বক্ষ
وَضَعْنَا	-	আমি অপসারণ করেছি, সরিয়ে দিয়েছি
وِزْرَكَ	-	আপনার বোঝা
اَلَّذِيْٓ	-	যা
اَنْقَضَ	-	ভেঙে দিয়েছিল, নুইয়ে দিয়েছিল
ظَهْرَكَ	-	আপনার পিঠ বা পৃষ্ঠদেশ
رَفَعْنَا	-	আমি উচ্চ করেছি, তুলে ধরেছি
ذِكْرَكَ	-	আপনার খ্যাতি, আলোচনা
اِنَّ	-	নিশ্চয়ই, অবশ্যই
مَعَ	-	সাথে, সঙ্গে
عُسْرٌ	-	কষ্ট, বিপদ, অমঙ্গল
يُسْرًا	-	স্বস্তি, শান্তি
فَرَغْتَ	-	আপনি অবসর লাভ করেন, অবকাশ পান
فَانْصَبْ	-	অতঃপর পরিশ্রম করুন, ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন, একান্তে ইবাদত করুন
فَارْغَبْ	-	অনন্তর মনোনিবেশ করুন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ — দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ — ১. আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ — ২. এবং আমি আপনার বোঝা অপসারণ করেছি।

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ — ৩. যা আপনার পৃষ্ঠদেশকে নুইয়ে দিয়েছিল। (যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক)।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ — ৪. আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ — ৫. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞	৬.	অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞	৭.	অতএব, যখনই আপনি অবসর পান, একান্তে ইবাদত করুন।
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞	৮.	এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

ব্যাখ্যা

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় আরবদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তারা নানা প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরি করত, তাঁকে মানত না এবং তারা মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (স.) এসব পছন্দ করতেন না। আরবদের মারামারি, হানাহানি তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত। তাদের এসব অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তাক্লিষ্ট থাকতেন। হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন। তিনি তাঁকে নবুয়ত দান করেন। সত্য পথের দিশা প্রদান করেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি-রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেন। নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন।

নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (স.) আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এতে মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। তারা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তারা মহানবি (স.) ও নও মুসলিম সাহাবিদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে। ফলে মুসলমানগণ তাদের অকথ্য জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তায়ালা এ সময় মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, দুঃখের পরই সুখ আসে। কাফিরদের এসব অত্যাচার নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বরং তিনি মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। এসব দুঃখকষ্টের পর তারা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, যখনই ইসলাম প্রচার, সাথিদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে তিনি অবসর হন তখনই তিনি যেন আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষা

১. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে খুলে দেন। তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন।

২. আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন।

৩. মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান মর্যাদা দান করেন।

৪. মানব জীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে।

৫. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এ সময়কে কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

৬. পার্থিব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও স্মরণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য।

কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-ইনশিরাহ -এর শিক্ষা সম্পর্কে ৫টি বাক্য শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

সূরা আত-তীন (سُوْرَةُ التِّيْنِ)

পরিচয়

সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৮। সূরার প্রথম শব্দ তীন থেকে এ সূরার নাম আত-তীন রাখা হয়েছে।

শানে নুযুল

বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল করা হয়নি। বরং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত কতিপয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা এতে মানবজাতির উৎপত্তি ও পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ সূরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

وَ - শপথ
اَلتِّيْنِ - আঞ্জির বা ডুমুর জাতীয় ফল
اَلزَّيْتُوْنِ - যায়তুন, জলপাই জাতীয় ফল
طُوْرِ - তুর পর্বত
سِيْنِيْنَ - সিনাই প্রান্তর
هٰذَا - এই
اَلْبَلَدِ - শহর, নগর
اَلْاَمِيْنِ - নিরাপদ
خَلَقْنَا - আমি সৃষ্টি করেছি
اَلْاِنْسَانَ - মানুষ, মানবজাতি
اَحْسَنِ - অতি সুন্দর
تَقْوِيْمٍ - আকৃতি, গঠন, অবয়ব
ثُمَّ - অতঃপর, পুনরায়, অনন্তর
رَدَدْنٰهُ - আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি-
اَسْفَلَ - সর্বনিম্ন
اِلَّا - ব্যতীত, তবে, ছাড়া
اَلَّذِيْنَ - যারা
اٰمَنُوْا - তারা ইমান এনেছে
عَمِلُوْا - তারা আমল করেছে
اَلصّٰلِحٰتِ - সৎকর্মসমূহ
اَجْرٌ - প্রতিদান
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ - অশেষ, অবারিত
مَا يُكَذِّبُكَ - কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে?
اَلدِّيْنِ - কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, কিয়ামত দিবস, জীবন-বিধান
اَحْكَمِ - শ্রেষ্ঠতম বিচারক
اَلْحٰكِمِيْنَ - বিচারকগণ

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○ ১. শপথ আঞ্জির ও যায়তুনের।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ○ ২. আর শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ	৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা নগরীর)।
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ	৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ	৫. এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ	৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ	৭. সুতরাং (হে মানুষ!) কিসে তোমাকে বিচার দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ	৮. আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

ব্যাখ্যা

সূরা আত-তীনের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুটি হলো আঞ্জির (ডুমুর জাতীয় ফল) ও যায়তুন। আঞ্জির হলো একটি উপাদেয় ফল। আর যায়তুনের ফল অত্যন্ত বরকতময় ও এর তৈল খুবই উপকারী। এ দুটি বৃক্ষ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হয়। আর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অগণিত নবি-রাসুল আগমন করেছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তুর পর্বতের শপথ করেছেন। এ পর্বত অত্যন্ত বরকতময় স্থান। এ পর্বতে হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করেন। আর সেখানেই তাওরাত কিতাব নাজিল হয়। তৃতীয় আয়াতে নিরাপদ নগরীর শপথ করা হয়েছে। আর এটা হলো মক্কা নগরী। এ নগরীতে মহানবি (স.) জন্মগ্রহণ করেন। এতে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা কাবা শরিফ অবস্থিত, সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ।

এ সূরায় প্রথম তিনটি আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ সূরায় সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানগণের জন্য পরকালে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পরকালে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য একত্র করবেন। এদিন হবে প্রতিফল দিবস বা শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তায়ালা হবেন সেদিনের একমাত্র বিচারক। তিনিই সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। মানুষের দুনিয়ার কৃতকর্মের জন্য তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।
২. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়।
৩. সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন।
৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন।

মহান আল্লাহ আখিরাত সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি সাবধান ও সতর্ক করেছেন। সুতরাং কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষের এটি অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তীন-এর অনুবাদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

পরিচয়

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭। এটি মক্কি সূরাগুলোর অন্তর্গত। সূরার শেষ শব্দ মাউন থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

اَرَاَيْتَ	- আপনি কি দেখেছেন?	اَلْمِسْكِيْنِ	- মিসকিন, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত
اَلَّذِىْ	- যে	فَوَيْلٌ	- অতঃপর ধ্বংস, দুর্ভোগ
يُكَذِّبُ	- অস্বীকার করে, মিথ্যারোপ করে	لِّلْمُصَلِّيْنَ	- সালাত আদায়কারীগণ
اَلدِّيْنِ	- কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, ধর্ম	سَاهُوْنَ	- উদাসীন, অবহেলাকারী
يَدُعُّ	- তাড়িয়ে দেয়	يُرَآءُوْنَ	- তারা দেখায়
اَلْيَتِيْمَ	- ইয়াতীম, অনাথ	يَمْنَعُوْنَ	- তারা দেয় না
لَا يَحُضُّ	- উৎসাহ দেয় না	اَلْمَاعُوْنَ	- গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু, নিত্যব্যবহার্য বস্তু।
طَعَامِ	- খাদ্য, আহার		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ — দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ — ১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে?

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ — ২. সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ — ৩. আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ — ৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝	৫.	যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝	৬.	যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝	৭.	এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু অন্যকে দেয় না।

ব্যাখ্যা

এই সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম আয়াতে কিয়ামত দিবস ও বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের কথা বলেছেন। আর কাফির মুনাফিকরাই মূলত বিচার দিবসের অস্বীকারকারী। তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন, তারা ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর, ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তারা জোর করে দখল করে। ইয়াতীমদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের রূঢ় ও নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি ইয়াতীম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে নিজেরা তো সাহায্য করেই না বরং অন্যকেও একাজে উৎসাহ দেয় না।

মুনাফিকদের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। বরং তারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। শুধু মুসলমানদের দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। অথচ সালাতে অবহেলার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

শিক্ষা

১. বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির-মুনাফিকদের কাজ।

২. ইয়াতীম ও দুঃস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

৩. ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে।

৪. কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।

৫. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা সূরা আল-মাউন-এর শিক্ষা একটি পোস্টারে লিখে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। সুন্নাহ অর্থ রীতিনীতি। ইসলামি পরিভাষায় মহানবি (স.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়। সুন্নাহ হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (স.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ

অর্থ : "আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে-اَقِیۡمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থ : "তোমরা সালাত কায়েম কর।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৭২)

কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মূলত, সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের পরিপূরক। আল-কুরআনে একে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন - وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَمَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا ۚ

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ বা হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। আল-কুরআনের পরই এর স্থান।

আল-হাদিস

হাদিস অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। হাদিসের দুটি অংশ: একটি সনদ (سَنَدٌ) ও অপরটি মতন (مَتْنٌ)। হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাঁকে বলা হয় রাবি বা বর্ণনাকারী। হাদিস বর্ণনায় হাদিসের রাবিগণের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ বা বর্ণনা পরম্পরাই সনদ (سَنَدٌ)। আর হাদিসের মূল বক্তব্য বা মূল অংশকে বলা হয় মতন (مَتْنٌ)। হাদিস শাস্ত্রে সনদ ও মতন উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকারভেদ

মতন বা হাদিসের মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে হাদিসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. কাওলি, খ. ফি'লি এবং গ. তাকরিরি

ক. কাওলি হাদিস

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণীসূচক হাদিসকে কাওলি হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ মহানবি (স.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ. ফি'লি হাদিস

ফি'লি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (স.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফি'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলা হয়।

গ. তাকরিরি হাদিস

তাকরিরি অর্থ মৌন সম্মতি জ্ঞাপক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিস আবার তিন প্রকার। যথা- (ক) মারফু, (খ) মাওকুফ ও (গ) মাকতু।

ক. মারফু হাদিস

যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ. মাওকুফ হাদিস

যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেনি এরূপ হাদিসকে মাওকুফ হাদিস বলে।

গ. মাকতু হাদিস

যে হাদিসের সনদ তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে। অন্যকথায়, যে হাদিসে কোনো তাবিঈর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতি বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, শরিয়তে আরও বহু প্রকারের হাদিস দেখা যায়। আমরা পরবর্তীতে এগুলো সম্পর্কে জানব।

হাদিসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো হাদিসে কুদসি। কুদসি শব্দের অর্থ পবিত্র। এ প্রকার হাদিস সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামি পরিভাষায়, যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূল কথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (স.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার হলেও তা আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হাদিস হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.) থেকেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ব্যাপকভাবে হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

তবে সাহাবিগণ মহানবি (স.)-এর বাণীসমূহ মুখস্থ রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (স.) কোন সময় কী কাজ করতেন তা খেয়াল রাখতেন। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা একবার যা স্মৃতিতে ধারণ করতেন কখনোই তা ভুলতেন না। ফলে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি বাণী ও কাজ সাহাবিগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতো। রাসুলুল্লাহ (স.)ও স্বয়ং তাঁদের হাদিস মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জীবন উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্থ করল ও সঠিকরূপে সংরক্ষণ করল এবং এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দিল যে তা শুনতে পায়নি।" (তাবারানি)। সাহাবিগণ রাসুল (স.)-এর কথা শুনতেন, তা মনে রাখতেন এবং তা হুবহু বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন ও

আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছে দিতেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশাতেই হাদিস সংরক্ষণ শুরু হয়।

তা ছাড়া লিখিত আকারেও সেসময় বেশ কিছু হাদিস সংরক্ষিত হয়। বহু সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদিস লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর সহিফা 'আস-সাদিকা'-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এ সহিফাতে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বহুসংখ্যক হাদিস লিখে রেখেছিলেন। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র-চুক্তিনামা, সনদ, ফরমান ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম সরকারিভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে নতুন গতি সঞ্চার হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ইমাম মালিক (র.) সর্বপ্রথম হাদিসের বিশুদ্ধ সংকলন তৈরি করেন। তাঁর এ গ্রন্থের নাম আল-মুয়াত্তা।

হিজরি ৩য় শতক ছিল হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি কিতাব সংকলিত হয়। এগুলোকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বলা হয়। এ ছয়টি গ্রন্থ এবং এদের সংকলকগণের নাম :

১. সহিহ বুখারি - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি (র.)

২. সহিহ মুসলিম - ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (র.)

৩. সুনানে নাসাই - ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসাই (র.)

৪. সুনানে আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআস (র.)

৫. জামি তিরমিযি - ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (র.)

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (র.)।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই মানুষকে নানা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থ : "আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম, আয়াত ৩-৪)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২)

আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবি (স.)-এর দায়িত্ব ছিল এসব বিধি-বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)

রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আরও ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারি। যেমন- কুরআন মজিদে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে কোন সময়, কত রাকআত সালাত আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ঠিক তেমনিভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানেরও হুকুম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে যাকাত দেবে, কাকে দেবে, কতপরিমাণ দেবে, এর কোনো নিয়ম সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (স.) হাদিসের দ্বারা আমাদের এসব নিয়ম-কানুন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমরা যথাযথভাবে এগুলো আদায় করতে পারছি। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

আর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদেশ-নিষেধ এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের জন্যও হাদিস জানা অত্যাবশ্যক। কেননা হাদিসের মাধ্যমেই আমরা এসব বিষয় জানতে পারি। মহানবি (স.) স্বয়ং হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -

অর্থ : "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা)

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রধান দুটি উৎস। এগুলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালনা করে। এ দুটোর শিক্ষা ও আদর্শ ত্যাগ করলে মানুষ প্রথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং মানবজীবনে আল-কুরআনের পাশাপাশি মহানবি (স.)-এর হাদিসের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ বা হাদিস -এর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

মহানবি (স.)-এর ১০টি হাদিস

পাঠ ১২

হাদিস ১

(নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

إِنَّمَا - প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, আসলে

اَلْأَعْمَالُ - আমলসমূহ, কর্মসমূহ

اَلنِّيَّاتُ - নিয়ত, সংকল্প, উদ্দেশ্য।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : "প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসটি সহিহ বুখারির সর্বপ্রথম হাদিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের সকল কাজই নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। কাজের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এ হাদিস দ্বারা বুঝতে পারা যায়। সাথে সাথে কোন কাজের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত তাও এ হাদিসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে জানা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় সে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

উপরে বর্ণিত হাদিসটির শেষাংশ জানলে আমরা নিয়তের বিশুদ্ধতার বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারব। এ হাদিসের শেষাংশে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নিয়তে (তাঁদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য) হিজরত করে তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যদি সে পার্থিব লাভ বা কোনো স্ত্রীলোককে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে তবে সে শুধু তাই লাভ করবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।

রাসুলুল্লাহ (স.) বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। আর তা হলো- উম্মে কায়স নামক একজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করার জন্য মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন। ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য জানতে পেরে নবি (স.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। যার মূল বক্তব্য হলো- আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত না থাকায় লোকটি হিজরতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলেন।

শিক্ষা

১. কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিয়ত বলা হয়।

২. নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ব্যক্তি উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ভালো কাজ করলেও ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে না।

৩. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন।

সুতরাং সকল কাজেই আমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখব। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো লাভের আশায় সৎকর্ম করব না, বরং আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি অনুবাদসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

হাদিস ২

[ইসলামের ভিত্তি (ইমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ) সম্পর্কিত হাদিস]

শব্দার্থ

بُنِيَ	- ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত	وَ	- এবং, ও, আর
عَلٰى	- উপর	اِقَامِ	- কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা
خَمْسٍ	- পাঁচ	اَلصَّلٰوةِ	- সালাত, নামায
شَهَادَةِ	- সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষ্য	اِيْتَاءِ	- প্রদান করা, আদায় করা
اِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া	اَلزَّكٰوةِ	- যাকাত
عَبْدُهٗ	- তাঁর বান্দা	صَوْمِ	- সাওম, রোযা
رَسُوْلُهٗ	- তাঁর রাসুল	رَمَضَانَ	- রমযান মাস

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔

অর্থ : "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে মহানবি (স.) ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।

এই হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিত খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটিও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু ঠিকভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এর কোনো একটি খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভূলুণ্ঠিত হয়। সুতরাং ইসলামের পূর্ণতার জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

শিক্ষা

১. ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি। এগুলো হলো- ইমান, সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সাওম।

২. ইমান হলো সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

৩. ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইমানের প্রকাশ ঘটাতে হবে।

৪. অতঃপর অন্যান্য ভিত্তি যথা- সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সাওমের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।

৫. এ পাঁচটি ভিত্তির একটি ছাড়াও ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পাঠ ১৪

হাদিস ৩

(দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

يَوْمٌ	-	দিন
يُصْبِحُ	-	সকালে উপনীত হয়
اَلْعِبَادُ	-	বান্দাগণ
مَلَكَانِ	-	দুজন ফেরেশতা
يَنْزِلَانِ	-	দুজন নাজিল হন, তারা দুজন অবতরণ করেন।
اَحَدُهُمْ	-	তাদের মধ্যে একজন
اَللّٰهُمَّ	-	হে আল্লাহ!
اَعْطِ	-	তুমি দান কর
مُنْفِقًا	-	খরচকারী, দানকারী
خَلَفًا	-	প্রতিদান
مُمْسِكًا	-	আটককারী, কৃপণ
تَلَفًا	-	ক্ষতি

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

অর্থ : "বান্দাগণ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলেই দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। এঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তুমি তার প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ আটককারীকে (কৃপণকে) ক্ষতিগ্রস্ত কর।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

মানবজীবনে অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দানশীলতার পুরস্কার ও কৃপণতার কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা ও দানশীলতা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। নানাভাবে একাজ করা যায়। সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য খরচ করাও একপ্রকার দানশীলতা। তা ছাড়া গরিব, অভাবী, ইয়াতীম, দুঃস্থ, ফকির-মিসকিনকে সাহায্য করাও সকলের কর্তব্য। দান করার মাধ্যমে মানুষের ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাহ্যিকভাবে এতে দেখা যায় যে, সম্পদ কমে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সম্পদ কমে না। বরং আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে দানশীলকে আরও প্রভূত পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয়। আসমানের ফেরেশতা প্রতিদিন সকালে তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে সে কৃপণ। তার সম্পদ কোনো কাজে আসে না। এতে কোনোরূপ কল্যাণ ও বরকত নেই। আসমানের ফেরেশতাগণও তার প্রতি বদদোয়া করেন। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা

১. দানশীলতা মহৎ গুণ।

২. দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা দানশীলকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. কৃপণতা নিন্দনীয় কাজ। কৃপণ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, আমরা দানশীল হব। গরিব, দুঃখী, অভাবীদের সাহায্য করব। নিজ পিতা-মাতা, ভাইবোনদের জন্য খরচ করব। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা মুখস্থ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

হাদিস ৪

(বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

مُسْلِمٍ	-	মুসলিম, মুসলমান	مِنْهُ	-	তা থেকে
يَغْرِسُ	-	রোপণ করে	طَيْرٌ	-	পাখি
غَرْسًا	-	বৃক্ষ	اِنْسَانٌ	-	মানুষ
يَزْرَعُ	-	আবাদ করে, চাষ করে	بَهِيْمَةٌ	-	চতুষ্পদ জন্তু
زَرْعًا	-	ফসল	اِلَّا	-	ছাড়া, ব্যতীত
يَأْكُلُ	-	ভক্ষণ করে, খায়	صَدَقَةٌ	-	সদকা, দান

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ-

অর্থ : "কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনায় হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণ ও কৃষি কাজ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য হাদিসে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে মহানবি (স.) আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আমরা অনেকেই বৃক্ষরোপণ বা কৃষিকাজকে ছোট কাজ বলে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজই ছোট নয়। সৎভাবে করা সকল কাজই উত্তম। বৃক্ষরোপণেও কোনো লজ্জা নেই। বরং এটি অনেক নেকির কাজ। স্বয়ং মহানবি (স.) আমাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। কেননা পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, ক্ষেতের ফসল খেয়ে থাকে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে। ঐ ফল-ফসল সদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

শিক্ষা

১. বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ।

২. বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি আখিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যাবে।

৩. মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৪. মানুষের উৎপাদিত ফল, ফসলে পশু-পাখি ও অন্য মানুষেরও হক রয়েছে।

৫. উৎপাদিত ফল, ফসল থেকে কোনো প্রাণী কিছু ভক্ষণ করলে তা বিনষ্ট হয় না। বরং তা সদকা হিসেবে আবাদকারীর আমলনামায় লেখা হয়।

কাজ : ক. শিক্ষার্থী বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলবে।
খ. প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ বাড়িতে একটি করে গাছ রোপণ করবে এবং শিক্ষককে তা জানাবে।
গ. শ্রেণি শিক্ষক সব ছাত্র/ছাত্রীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠে একটি বৃক্ষরোপণ করে শিক্ষার্থীদের বাস্তবে বৃক্ষরোপণের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিতে পারেন।

পাঠ ১৬

হাদিস ৫

(সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اُنَبِّئُكُمْ	-	আমি তোমাদের খবর দেব
خِيَارِكُمْ	-	তোমাদের মধ্যে উত্তম
قَالُوْا	-	তাঁরা বললেন
بَلٰى	-	হ্যাঁ
اَلَّذِيْنَ	-	যারা
اِذَا	-	যখন
رُءُوْا	-	দেখা হয়
ذُكِرَ	-	স্মরণ হয়।

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خِيَارُكُمْ اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আমি কি তোমাদের ভালো লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন- তোমাদের মধ্যে ভালো লোক তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।" (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বস্তুত সর্বোত্তম মানুষ হলেন তাঁরা, যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়। ঐসব ব্যক্তি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকেন। এরূপ লোকদের দেখলেই আল্লাহর স্মরণ এসে যায়। মানুষের মধ্যে এসব লোকই সর্বোত্তম।

সমাজে আমরা বহু লোকের সাথে চলাফেরা করি। তাদের সকলকে দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয় না। সুতরাং যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এতে তাঁদের প্রভাব আমাদের উপরও পড়বে। আমরাও তাদের ভালো কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হব। আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা, আচার-আচরণ সুন্দর হবে। ফলে আমরাও উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারব।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালার স্মরণ সর্বোত্তম কাজ।

২. মানুষের মর্যাদা ধন-দৌলত, শিক্ষা বা ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং দীন পালনের মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়।

৩. যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হয় তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি।

আমরা দীনদার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখব। তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করব।

পাঠ ১৭
হাদিস ৬

(মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اَلْخَلْقُ - সৃষ্টিজগৎ, মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল

عِيَالٌ - পরিজন, আপনজন

اَحَبُّ - অধিক প্রিয়, সর্বাধিক প্রিয়

مَنْ - যে

اَحْسَنَ - অনুগ্রহ করে, সদাচরণ করে

اِلٰى - প্রতি, দিকে

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ۔

অর্থ : "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁরই সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। বস্তুত জিন-ইনসান, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। এটা তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সকল কিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা, সকল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি অনুগ্রহ করা। এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। যাঁরা আল্লাহ তায়ালার এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করেন তাঁরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ভালোবাসেন।

শিক্ষা

১. সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজন স্বরূপ।

২. এদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ।

৩. জীবজন্তু, পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

৪. সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা লিখে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮
হাদিস ৭
(পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اَخٌ	- ভাই	حَاجَةٌ	- প্রয়োজন
لَا يَظْلِمُهُ	- সে তার প্রতি অত্যাচার করে না	اَخِيْهِ	- তার ভাই
لَا يُسْلِمُهُ	- তাকে সোপর্দ করে না		

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ

অর্থ : "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তারা সকলে একই আদর্শে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী। ফলে পৃথিবীর যে স্থানেই কোনো মুসলমান থাকুক না কেন সকলেই ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এতে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ নেই। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আরব-অনারব সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না ও জুলুম-নির্যাতন করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। তার জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করতে হবে। শত্রুর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে হবে। তার শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না। ছোট-বড় যেকোনো প্রয়োজনে অপর মুসলমান ভাইকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হবে। সামর্থ্য থাকলে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় বুদ্ধি পরামর্শ ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তাকে সাহায্য করতে হবে।

বস্তুত নিজের সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিকভাবে অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। এতে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তিনি স্বয়ং সাহায্যকারীকে সাহায্য করেন। তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

শিক্ষা

১. মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই।
২. তারা পরস্পর অন্যায় অত্যাচার করবে না।
৩. শত্রুর মোকাবিলায় সকলে একত্রে এগিয়ে আসবে।
৪. বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।
৫. সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রিয়। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯
হাদিস ৮

(ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

اَلتَّاجِرُ	-	ব্যবসায়ী, বণিক	اَلشُّهَدَاءُ	-	শহিদগণ, শাহাদাত লাভকারীগণ
اَلْاَمِيْنُ	-	বিশ্বস্ত	مَعَ	-	সঙ্গে, সাথে
اَلصَّدُوْقُ	-	সত্যবাদী	يَوْمُ	-	দিবস, দিন

اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : "বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।" (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয়নবি (স.)ও ব্যবসা করেছেন। সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সেদিন তাঁদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না। বরং তাঁরা সেদিন আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবেন। শহিদগণ হলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সৎ ব্যবসায়ীগণও কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন। তাঁরাও শহিদগণের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। **প্রথমত,** সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। অর্থাৎ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। অন্যদিকে, ব্যবসায় প্রতারণা করলে, মিথ্যা বললে এ কল্যাণ লাভ করা যাবে না। সুতরাং ব্যবসা ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ ত্যাগ করতে হবে। লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। ওজনে কম দেওয়া, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করা, মওজুতদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই কিয়ামতে শহিদগণের সঙ্গী হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করা যাবে।

শিক্ষা

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল পেশা। তবে তা ইসলামি নীতি আদর্শের অনুসরণে করতে হবে।

২. ব্যবসায়ে সততা ও বিশ্বস্ততা মহৎ গুণ। সকলকেই এগুলোর অনুশীলন করতে হবে।

৩. বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থী হাদিসটি আরবিতে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২০
হাদিস ৯

(ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

عَجَبًا	-	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক
اَلْمُؤْمِنِ	-	মুমিন, ইমানদার
اَمْرَهُ	-	তার কাজ
خَيْرٌ	-	কল্যাণ, ভালো
اِلَّا	-	ব্যতীত, ছাড়া
اَصَابَتْهُ	-	তার নিকট পৌঁছায়
ضَرَّاءُ	-	দুঃখ-কষ্ট, বিপদ
صَبَرَ	-	ধৈর্যধারণ করে
سَرَّاءُ	-	খুশি, আনন্দ
شَكَرَ	-	শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
لَهُ	-	তার জন্য

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

অর্থ : "মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মানবজীবনের নানা অবস্থায় কীরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুন্দর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবজীবনে সুখ-শান্তির পাশাপাশি দুঃখ-কষ্টও বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ্ তায়ালার পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্ তায়ালা সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এরূপ করে থাকেন। ফলে সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। কেননা দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলে মুমিন ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়েন না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অন্যায় কাজ করেন না। বরং এ অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করেন ও ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। এতে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাকে সাওয়াব দান করেন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। ফলে দুঃখ-কষ্টের অবস্থাও মুমিন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

আর সুখ-শান্তির অবস্থাতেও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যান না। বরং তিনি সুখ-শান্তি ও নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শোকর করেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর খুশি হন ও তাঁর নিয়ামতসমূহ আরও বাড়িয়ে দেন। ফলে এ অবস্থায় মুমিন ব্যক্তি সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করেন।

শিক্ষা

১. সুখ-দুঃখ মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়।

২. দুঃখ-কষ্টের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করতে হবে।

৩. আনন্দের সময়ও আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ভুলে গেলে চলবে না। বরং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৪. এভাবে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শোকর ও সবরের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়।

৫. মুমিন ব্যক্তির সকল কাজই কল্যাণজনক। কেননা, মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করেন। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্ বিমুখ হন না। ফলে সবর ও শোকরের মাধ্যমে তিনি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করেন। প্রকৃত মুমিন হতে হলে আমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

> **কাজ :** শিক্ষার্থী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা নিজ খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২১

হাদিস ১০

(যিকির সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

كَلِمَتَانِ - দুটি বাক্য		ثَقِيْلَتَانِ - খুবই ভারী	
حَبِيْبَتَانِ - খুবই প্রিয়		اَلْمِيْزَانِ - দাঁড়িপাল্লায়	
اَلرَّحْمٰنِ - দয়াময়		سُبْحَانَ - মহা পবিত্র	
خَفِيْفَتَانِ - খুবই সহজ		بِحَمْدِهٖ - তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা	
اَللِّسَانِ - জিহ্বা		اَلْعَظِيْمِ - মহামহিম	

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

অর্থ : দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে সহজ ও দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী। বাক্য দুটি হলো "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম" (আল্লাহ্ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। মহাপবিত্র আল্লাহ্, তিনি মহামহিম)। (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মহানবি (স.) উম্মতকে দুটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো হলো :

প্রথম বাক্য : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

দ্বিতীয় বাক্য : সুবহানাল্লাহিল আযিম

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন উম্মতের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। এজন্য তিনি আমাদের অতীব বরকতময় এ দুটি যিকির শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ফজিলতও বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, এ বাক্যদ্বয় আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কেননা এতে মহান আল্লাহর পবিত্রতা, মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা বাংলাভাষী। আরবি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তথাপি এ বাক্যদ্বয় খুবই সুন্দর ও সাবলীল। আমরা খুব সহজেই এগুলো উচ্চারণ করতে পারি, মুখস্থ করতে পারি। এগুলো উচ্চারণে কোনোরূপ জিহ্বার আড়ষ্টতা সৃষ্টি হয় না, কোনোরূপ কষ্ট হয় না। বস্তুত এ দুটো সহজ সরল ও সুন্দর বাক্য।

তৃতীয়ত, এ বাক্যদ্বয় মিযানে বা দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী হবে। কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্ম দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। নেকির পাল্লা ভারী হলে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর নেকির পাল্লা হালকা হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এ বাক্যদ্বয়ের সাওয়াব ওজনে খুবই ভারী। মিযানে এগুলো নেকির ওজনকে ভারী করে তুলবে।

অতএব, আমরা এ বাক্য দুটো মুখস্থ করব এবং সদাসর্বদা পাঠ করব। ফলে মহামহিম ও মহাপবিত্র আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং অধিক পরিমাণ প্রতিদান দেবেন ।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালা মহাপবিত্র, মহামহিম। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে তিনি খুশি হন।

২. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম- আল্লাহ তায়ালার প্রিয় দুটি বাক্য। আমরা সদা সর্বদা এ বাক্যদ্বয়ের যিকির করব।

৩. হাশরের দিন মিযানে এ বাক্যদ্বয় খুবই ভারী হবে। ফলে এর পাঠকারী সফলতা লাভ করবে।

কাজ : শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে পোস্টারে আরবিতে একটি হাদিস লিখে এনে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২২

শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা

পরিচয়

শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা মহানবি (স.)-এর পরবর্তী যেকোনো যুগে হতে পারে। সাহাবিগণ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি বিরোধী কিংবা কোনো অন্যায় ও পাপ কাজে ইজমা হয় না। ইজমা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নিয়ামত।

ইজমার উৎপত্তি

ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো সমস্যার সমাধান করা কিংবা নতুন বিধান প্রবর্তন করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময় হতেই এর ব্যবহার বা প্রচলন লক্ষ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিগণের পরামর্শ নিতেন। অতঃপর তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

অর্থ : "আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ৩৮)

এভাবেই রাসুলুল্লাহ (স.) ইজমার বৈধতা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সাহাবিগণের যুগে এর পূর্ণাঙ্গ প্রচলন ঘটে। খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি (স.)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে সাহাবিগণের ঐকমত্যের মাধ্যমেই কুরআন সংকলনের কাজ শুরু করা হয়। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে বিশ রাকআত তারাবি-এর সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পরবর্তী যুগগুলোতেও ইজমার মাধ্যমে নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা হয়েছে।

ইজমার হুকুম ও কার্যকারিতা

ইজমা শরিয়তের তৃতীয় উৎস। বিধি-বিধান নির্ধারণে ইজমা অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত। সাধারণভাবে ইজমার ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব।

ইজমার গুরুত্ব ও বৈধতা

ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থ : "এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে উম্মতে মুহাম্মদি তথা মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইজমার পরোক্ষ দলিল স্বরূপ।

মুসলিম মুজতাহিদগণ একমত হয়ে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে তার বিরোধিতা করা চরম পাপ। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ

অর্থ : "সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনগণের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৫)

উক্ত আয়াতে মুমিনদের অনুসৃত পথ বলতে মুসলিমদের ঐকমত্য বা ইজমা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন-

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-

অর্থ : "মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ তায়ালার নিকটও ভালো।" (তাবারানি)

এ হাদিস দ্বারাও ইজমা তথা মুসলমানদের ঐকমত্যের গুরুত্ব প্রমাণিত।

মহানবি (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত (রহমত ও সাহায্য) দলবদ্ধ থাকার উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) দোযখে যাবে।" (তিরমিযি)

ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এর বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক।

কাজ : শিক্ষার্থী আল-ইজমার পরিচয়, উৎপত্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৩

শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস

পরিচয়

শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। অন্য কথায়, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সমস্যার সমাধান করাই হলো কিয়াস।

কিয়াসের গুরুত্ব

কিয়াস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। ইজমার পরই এর স্থান। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার

সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কেননা, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। এটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবন-বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে শরিয়তের বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন এগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বযুগে সর্বকালে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আর এ পদ্ধতির নামই কিয়াস। সুতরাং শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াস অপরিহার্য।

আল-কুরআন ও হাদিসে কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ ○

অর্থ : "অতএব, হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কিয়াস মুসলিম জ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনারই ফল।

কিয়াস শরিয়তের সর্বনিম্ন স্তর। যখন কোনো বিষয়ে আল-কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পরিষ্কারভাবে সমাধান পাওয়া যায় না তখনই কিয়াস প্রযোজ্য হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকে কিয়াস করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহানবি (স.) যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?' হযরত মুআয (রা.) বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও, তবে?' তিনি বললেন, তাহলে নবির সুন্নাহ মোতাবেক। রাসুল (স.) পুনরায় বললেন, 'যদি তাতেও না পাও, তাহলে?' হযরত মুআয (রা.) বললেন, তা হলে আমি আমার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তাঁর উত্তর শুনে নবি (স.) বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসুলের দূত দ্বারা এমন উত্তর প্রদান করালেন যাতে তাঁর রাসুল সন্তুষ্ট হলেন।" (আবু দাউদ)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসে স্পষ্টভাবে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়াস যে শরিয়তের অন্যতম উৎস এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিয়াসের নীতিমালা

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। পরবর্তী যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে নিজের খেয়ালখুশি মতো স্বার্থপরভাবে কিয়াস করা বৈধ নয়। শরিয়তের ইমামগণ কিয়াস করার ব্যাপারে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো হলো :

ক. যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।

খ. কিয়াস কখনোই কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী হবে না।

গ. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

ঘ. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত আইনের মূলনীতি বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

প্রকৃতপক্ষে, কিয়াস ইসলামি শরিয়তের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উৎস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীল করেছে ও সর্বজনিনতা দান করেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা আল-কিয়াস-এর পরিচয়, গুরুত্ব ও নীতিমালা সম্পর্কে ১৫টি বাক্য বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৪

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

শরিয়ত হলো ইসলামি বিধি-বিধানের সমন্বিত রূপ। পরিভাষায় শরিয়ত বলতে এমন সুদৃঢ় সোজাপথকে বুঝায় যার দ্বারা তার অবলম্বনকারী ব্যক্তি হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারেন। আর আহকাম হলো বিধানাবলি।

প্রতিটি বিষয়েরই নিজস্ব কিছু পরিভাষা থাকে। ইসলামি শরিয়তেরও এরূপ বেশ কিছু পরিভাষা বিদ্যমান। এসব পরিভাষার মাধ্যমে শরিয়তের বিধানাবলির পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইসলামি শরিয়তের আহকাম বা বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি। এ পাঠে আমরা উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব।

ফরজ

ফরজ (فَرْضٌ) অর্থ অবশ্য পালনীয়, অত্যাবশ্যক। শরিয়তের যেসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা অবশ্য কর্তব্য ও অলঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত তাকে ফরজ বলা হয়।

ফরজ কাজ কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না। ফরজ অস্বীকার করলে ইমান থাকে না বরং এর অস্বীকারকারী কাফির হয়। আর এগুলো পালন না করলে কবিরা গুনাহ বা মারাত্মক পাপ হয়। ফরজ কাজ পালন না করলে আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

ফরজ দুই প্রকার। যথা- ১. ফরজে আইন
২. ফরজে কিফায়া

১. ফরজে আইন

যে সকল ফরজ বিধান সকলের উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে। অর্থাৎ যেসব ফরজ কাজ ব্যক্তিগতভাবে সকল মুসলমানকেই আদায় করতে হয় তা-ই ফরজে আইন। যেমন- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, এসব কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজে আদায় করতে হয়।

২. ফরজে কিফায়া

ফরজে কিফায়া হলো সামষ্টিকভাবে ফরজ কাজ। অর্থাৎ যেসব কাজ মুসলমানের উপর ফরজ, কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি আদায় করে ফেলে তবে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিছু লোকের আদায় করার দ্বারা সমাজের বাকি সবাই সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে যদি সমাজের কেউই আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন- জানাযার সালাত। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ঐ এলাকার সবার উপর তার জানাযার সালাত আদায় করা ফরজ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি তার জানাযার সালাত আদায় করে ফেলে তবে সকলেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু কেউই যদি মৃতব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় না করে তবে সকলেই ফরজ ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

ওয়াজিব

ওয়াজিব অর্থ : অবশ্য পালনীয়, কর্তব্য, অপরিহার্য ইত্যাদি। শরিয়তের এমন কিছু বিধান রয়েছে যা পালন করা কর্তব্য। তবে ফরজ নয়। এরূপ বিধানকে ওয়াজিব বলা হয়।

শরিয়তে ফরজের পরই ওয়াজিবের স্থান। এটি ফরজের কাছাকাছি। অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হলেও এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ওয়াজিব অস্বীকার করলে মানুষ কাফির হয় না। তবে সে বড় রকমের অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। ওয়াজিব কাজ আদায় না করলেও কঠিন পাপ হয়। এর জন্য আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। ইসলামি শরিয়তে বহু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- দুই ঈদের সালাত, বিতরের সালাত ইত্যাদি। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- সূরা ফাতিহা পড়া, রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সিজদাহর মধ্যে সোজা হয়ে বসা ইত্যাদি। সালাতের এসব ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সিজদাহ সাহু দিতে হয়। নতুবা সালাত শুদ্ধ হয় না। পুনরায় তা আদায় করতে হয়।

সুন্নত

সুন্নত অর্থ- পথ, পন্থা, রীতি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায় মহানবি (স.) থেকে যে সমস্ত কাজ ইসলামি শরিয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সুন্নত। অর্থাৎ যে সকল কাজ মহানবি (স.) নিজে করেছেন বা যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দুই প্রকার। যথা-

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ
২. সুন্নতে যায়িদাহ।

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

যে সকল কাজ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে সর্বদাই পালন করতেন, অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে। যেমন- আযান ও ইকামত দেওয়া, ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

২. সুন্নতে যায়িদাহ

সুন্নতে যায়িদাহ হলো অতিরিক্ত সুন্নত। পরিভাষায়, যে সকল কাজ নবি (স.) করেছেন বলে প্রমাণিত তবে তিনি সর্বদা তা পালন করতেন না, বরং কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন এসব কাজকে সুন্নতে যায়িদাহ বলা হয়। মহানবি (স.) এরূপ কাজ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি তাগিদ করেননি এবং তা না করলে গুনাহ হয় না। সুন্নতে যায়িদাহকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহও বলা হয়। যেমন- আসর ও এশার ফরজের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করা। সুন্নতে যায়িদাহ পালনে অনেক সাওয়াব অর্জন করা যায়।

মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয়। যে সকল কাজের প্রতি রাসুলুল্লাহ (স.) উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তা করলে নেকি পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না সেসব কাজকে শরিয়তে মুস্তাহাব বলে।

ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত অতিরিক্ত সবধরনের ইবাদত ও ভালো কাজই মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। এ মুস্তাহাবকে নফল বা মানদুবও বলা হয়।

মুবাহ

যে সকল কাজ করলে কোনোরূপ সাওয়াব নেই, আবার না করলে কোনোরূপ গুনাহও হয় না এরূপ কাজকে মুবাহ বলা হয়। মানুষ ইচ্ছা করলে এরূপ কাজ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা না-ও করতে পারে।

হালাল-হারাম

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই এ বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থ : "তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৯)

আর এ সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট বস্তুর কিছু কিছু হালাল করে দিয়েছেন আর কিছু কিছু বস্তুকে হারাম করে দিয়েছেন। যেসব বস্তু মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর সেগুলোকে হালাল করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষের জন্য অকল্যাণকর তা হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর নবি-রাসুলও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে হালাল-হারামের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত হালালকে গ্রহণ করা ও যাবতীয় হারাম বস্তু ও কাজকে বর্জন করা। এ পাঠে হালাল ও হারাম সম্পর্কে আমরা জানতে চেষ্টা করব।

হালাল

হালাল অর্থ- বৈধ, সিদ্ধ, আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। এছাড়া পবিত্র, গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি অর্থেও হালাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যে সকল বিষয়ের বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, শরিয়তে তাকে হালাল বলা হয়। হালাল কথা, কাজ বা বস্তু সবই হতে পারে। যেমন- যেসব বস্তু বা দ্রব্য ব্যবহার করা শরিয়তে বৈধ তা হালাল দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। যেমন- গরুর গোশত, চাল-ডাল, ফলমূল আহার করা, শালীন ও রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব কথা বা কাজের অনুমতি দিয়েছেন সেগুলো হালাল কাজ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন- সত্য কথা বলা, সুন্নত সম্মত পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি।

হারাম

হারাম হলো হালালের বিপরীত। হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। পরিভাষায় যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স.) যেসব কাজ করতে বা যেসব বস্তু ব্যবহার করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম। যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়াখেলা, শূকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা ইত্যাদি হারাম।

হালাল-হারামের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে হালাল ও হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেছেন-

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ -

অর্থ : "হালাল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। আর হারামও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত।" (বুখারি ও মুসলিম)

পৃথিবীতে হালাল জিনিস বা বস্তু অগণিত। এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এগুলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط

অর্থ : "তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে গুনে তা শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৪)

শরিয়তের ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয় মুবাহ বা বৈধ। তবে এর বিপক্ষে কুরআন ও হাদিসে যদি কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তবে তা হারাম হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, হালালের সংখ্যা অগণিত। আর হারাম বস্তুর সংখ্যা সীমিত।

এসব হালাল ও হারাম বিষয়গুলো চিনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা হালালকে হারাম মনে করা ও হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফর। যেহেতু হারাম সীমিত সংখ্যক, সেহেতু নিম্নে বর্তমান সমাজে প্রচলিত কতিপয় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকা উল্লেখ করা হলো :

১. মৃত জীবজন্তু খাওয়া (তবে মৃত মাছ খাওয়া হারাম নয়)।
২. রক্ত পান করা (তবে হালাল জন্তুর গোশতে লেগে থাকা রক্ত হারাম নয়)।
৩. মানুষের গোশত খাওয়া।
৪. শূকরের গোশত খাওয়া।
৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৬. মদ্যপান করা।
৭. মাদকদ্রব্য যেমন- হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম সেবন করা।
৮. গলা টিপে, উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে হত্যাকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৯. হিংস্র প্রাণী যেমন- বাঘ, সিংহ, ভল্লুক ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
১০. বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রাণীর গোশত খাওয়া। যেমন- সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি।
১১. যেসব প্রাণী ময়লা ও নাপাক দ্রব্য খেয়ে বাঁচে তাদের গোশত খাওয়া। যেমন- কাক, শকুন, কুকুর ইত্যাদি।
১২. গাধা, খচ্চর, হাতি ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
১৩. সুদ, ঘুষ ও জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
১৪. চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত দ্রব্য।
১৫. অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন।
১৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা হলফ করা, গিবত, গালি-গালাজ করা।
১৭. সর্বোপরি অশ্লীল, অশালীন ও মানুষকে কষ্টদায়ক সকল দ্রব্য, কথা ও কাজ।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও সুন্নতে নিষেধকৃত সকল বস্তুই হারাম। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

মানবজীবনে হালালের প্রভাব

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোনটা উপকারী ও কোনটা অপকারী। যেসব দ্রব্য ও বিষয় মানুষের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা তা হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ : "হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮)

হালাল বস্তু গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত গ্রহণ করে এবং সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। মানুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

অর্থ : "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৫১)

হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। অন্তরে নুর সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ অন্যায় ও অসৎ চরিত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ সৎগুণাবলি সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে। বস্তুত হালাল খাদ্য মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাব ও আত্মশুদ্ধির উদ্রেক করে। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

মানবজীবনে হারামের প্রভাব

মানব জীবনে হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। এগুলো অনেক সময় মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত করে। এমনকি অনেক মারাত্মক ও প্রাণনাশক রোগ সৃষ্টি করে। যেমন- মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি।

তা ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হিংস্র প্রাণীর দেহে এমন সব জীবাণু আছে যা মানুষের দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি। এতে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয়, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়, সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়, অনেকে সর্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হয়ে যায়। এমনকি অনেকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

হারাম খাদ্যদ্রব্য মানুষের অন্তরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ অন্যায়, অশ্লীলতা ও অসৎচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানব চরিত্রের সৎগুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার ইবাদত-দোয়া কবুল হয় না। মহানবি (স.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট বলতে থাকে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তার পানাহার হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম। সুতরাং এমতাবস্থায় তার দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে?" (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে বলেছেন- "যে শরীর হারামের মাধ্যমে গঠিত, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।" (আহমাদ, বায়হাকি ও দারিমি)

প্রকৃতপক্ষে, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আমরা সদা সর্বদা হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকব। সকল কথা, কাজ ও পানাহারে হালাল পন্থা গ্রহণ করব।

কাজ : শিক্ষার্থী শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সূরা আত-তীন এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা বর্ণনা কর।

২. মুনাফিকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. আধুনিক যুগে কিয়াসের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. لَا تَقْهَرْ (লা-তাক্হার) অর্থ কী?

ক. ধমক দেবেন না খ. নিষেধ করবেন না

গ. আশ্রয় দেবেন না ঘ. কঠোর হবেন না।

২. ওহি লেখক সাহাবিদের সংখ্যা কত ছিল ?

ক. ২৮ খ. ৪২

গ. ৪৭ ঘ. ৮৬।

৩. মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা করা হয়েছে –

i. শিরক-কুফরের পরিচয়

ii. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা

iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ - ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আলম সাহেব গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ দখল করে, ছোট ভাইয়ের সন্তানদের বাড়ি থেকে বের করে দেন।

৪. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে কাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে ?

ক. গরিবদের খ. অসহায়দের

গ. ইয়াতীমদের ঘ. বঞ্চিতদের।

৫. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন উৎসের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে ?

ক. কুরআন খ. হাদিস

গ. ইজমা ঘ. কিয়াস ।

৬. আলম সাহেবের কাজের জন্য তাকে কী বলা যায় ?

ক. ফাসিক খ. কাফির

গ. মুনাফিক ঘ. যালিম ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১ । সাজিব ও সাজিদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু । সাজিব প্রায়ই ফজরের সালাত সূর্যোদয়ের পর এবং আসরের সালাত সূর্যাস্তের সময় আদায় করে । সাজিদ এলাকার যুবকদের সত্য কথা বলা ও নিয়মিত সালাত আদায় করার জন্য আহ্বান জানালে কতিপয় যুবক তার কথা শুনে কটূক্তি করে । যুবকদের অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে সে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়, শিক্ষক কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান–

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ক. 'ফারগব' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি'– বুঝিয়ে লেখ ।

গ. সাজিবের কাজের মাধ্যমে কাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. সাজিদের কার্যক্রম সূরা আল-ইনশিরাহ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

২ । নাসির ও জাবির সাহেব দুই বন্ধু । নাসির সাহেব তার বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন । মানুষেরা সেই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায় । নাসির সাহেব প্রতিবেশীদেরও ফল দেন । আর জাবির সাহেবের দোকানে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় হয় । কোনো ভেজাল নেই । তাই অনেক মানুষ রমযান মাসে তার দোকানে বাজার করে ।

ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎসের নাম কী?

খ. হারাম বর্জনীয় কেন?

গ. নাসির সাহেবের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. জাবিরের কাজের ফলাফল ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর ।